ভাববাদের বিরোধী অক্ষয়কুমার দত্ত রইলেন বিস্মৃত

ইচ্ছে করে বারবেলা, কালবেলা, কালরাত্রি, অশ্লেষা, মঘা, ত্র্যহস্পর্শ প্রভৃতি 'অশুভ' দিনক্ষণ দেখে ঠিক সেই সময় ও লগ্নে ভ্রমণে বের হতেন অক্ষয়কুমার দত্ত। বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা প্রমাণ করেছেন বিজ্ঞান ভাবনা দিয়ে। নিঃশব্দেই গতকাল কেটে গিয়েছে তাঁর দ্বিশততম জন্মবর্ষ। লিখেছেন ডঃ তাপস চট্টোপাধ্যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবজাগরণের প্রভাবে বাঙালি সমাজের শিক্ষিত অংশের চিন্তা-চেতনা ও সমাজবদ্ধতার উন্মেষপর্বে, যাঁর নাম চিরস্মরণীয়, তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত (জন্ম ১৮২০-মৃত্যু ১৮৮৬)। তাঁর নাম ও কর্মজীবন প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে উচ্চারিত হয় নবজাগরণপর্বের অন্যতম পুরোধাঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম। এঁরা দুজন প্রায় সমবয়সি। তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্তির মধ্যে দিয়ে ১৮৪৩-'৫৫ সময়কালে এঁরা হয়ে ওঠেন অভিন্নহৃদয় বন্ধু এবং চিন্তার জগতে পরস্পরের পরিপূরক। যেমন ছিলেন কার্লমার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস। ঈশ্বরচন্দ্র জন্মেছিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে, অক্ষয়কুমার স্বল্প শিক্ষিত কায়স্থ পরিবারে। অভিভাবকের সজাগ অভিনিবেশ একেবারে শিশুকাল থেকে বিদ্যাসাগরের বেড়ে ওঠা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। যদিও তা সম্ভব হয়েছিল দারিদ্র্য, পরিশ্রম ও দুঃসহ কষ্টের সঙ্গে অপরিসীম সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। অপরদিকে, অভিভাবকের উদাসীনতায় অক্ষয়কুমারের জীবনের অনেকগুলি বছর নষ্ট হয়েছিল। সহমত শিক্ষায় চর্চিত জমিতে পাশ্চাত্য দর্শন, আধুনিক সমাজভাবনা, সমাজসংস্কার, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বীজ ছড়িয়ে দেন বিদ্যাসাগর।

এলোমেলো স্বভাবের অক্ষয়কুমারের তেমন কোনও বাধ্যবাধকতা বা অভিমুখ ছিল না। তিনি তরুণ বয়স থেকে ইংরেজি সাহিত্য, অন্যান্য পাশ্চাত্য ভাষা, আধুনিক গণিত, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূবিদ্যা, নৃবিজ্ঞান এবং দর্শন অধ্যয়ন করতে থাকেন। ভালো করে সংস্কৃত শেখেন একটু বড় বয়সে। পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী মন, বিজ্ঞানবদ্ধ চেতনা ও চর্চিত মন নিয়ে তিনি সাহিত্য, সংস্কৃতি, সাংবাদিকতা, ভাষাতত্ত্ব ও সমাজ আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন। এভাবেই যেন দুই পাহাড়চূড়া থেকে যাত্রা শুরু করে একই উপত্যকায় এসে মিলিত হলেননবজাগরণের এই দুই অগ্রদূত।অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন আধুনিক বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা এবং ফ্রান্সিস বেকনের বস্তুবাদী দর্শনের প্রগাঢ় অনুরাগী। হাতেকলমে বিজ্ঞানচর্চার অভিজ্ঞতা তাঁর অর্জন। নিজের চেষ্টায় প্রথাগত শিক্ষার বাইরে এই অর্জন করেছিলেন তিনি। শুধু বেকন নন, তাঁর মননকে সমৃদ্ধ করেছিলেন নিউটন, লক, ফরাসি অসিক্লোপেদি গোষ্ঠী, হিউম, কান্ট, হুম্বোলট, জন স্টুয়ার্ট মিল, ডারউইন, হাক্সলি প্রমুখ সমকালীন চিন্তাবিদ। পাশাপাশি ভারতীয় সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাস, ধর্মচর্চার বিবর্তন, বেদ ও উপনিষদ তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন গভীর অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে।

ইংরেজ শাসনে ভারতীয়দের বিশেষত বাঙালি কৃষক ও শ্রমজীবীদের ভয়ানক দুর্দশার প্রতিবাদে তিনি ছিলেন বরাবর তীক্ষ্ণভাবে সচেতন ও সরব। অকুতোভয়ে লিখে গিয়েছেন জমিদারি প্রথার উৎপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে। তিনি ছিলেন নাস্তিক ও অজ্ঞেয়বাদী। ঈশ্বরচর্চা প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত সমীকরণ সেইকালে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল। বিখ্যাত সেই সমীকরণটি ছিল- পরিশ্রম=শস্য/পরিশ্রম+প্রার্থনা=শস্য, অতএব, প্রার্থনা=শূন্য। তাঁর বিখ্যাত কিছু বইয়ের মধ্যে আছে 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার'(১৮৫১), 'ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়'(দুই খণ্ডে প্রকাশিত এই বইয়ে তিনি ১৮২টি সম্প্রদায়ের জীবনাচরণ বিশ্লেষণ করে ভাববাদী চিন্তায় অসারতা প্রমাণ করেছিলেন (১৮৭০ এবং ১৮৮৩), 'চারুপাঠ' (১৮৮০), 'ধর্মনীতি' (১৮৭৫), 'বাষ্পীয় রথারোহী'দের প্রতি উপদেশ (১৮৫৫) ইত্যাদি। মাত্র ৩৫ বছর বয়স থেকেই অক্ষয়কুমার অসুস্থ হয়ে পড়েন। জীবনভর এই অসুস্থতা তাঁকে তাড়া করেছে। কিন্তু একদিনের জন্যও তিনি কাজ থেকে বিরত হননি। জীবনের শেষ পর্বে বই লিখেছেন ডিকটেশন দিয়ে। অক্ষয়কুমার এবং বিদ্যাসাগরের সমাজবদ্ধতার পরিপূরক ভূমিকার কথা আমরা উল্লেখ করেছি।

প্রাচীন ভারতীয় দর্শন, বিশেষত সাংখ্য ও বেদান্তের বাস্তববিমুখ অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তীক্ষ্ণ সমালোচনা করলেও বিদ্যাসাগর সেব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা কখনও দেননি। অক্ষয়কুমার কিন্তু ওই কাজটার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ে অবহিত ও আগ্রহী হলেও হাতেকলমে বিজ্ঞানচর্চার অভিজ্ঞতা বিদ্যাসাগরের ছিল না। অক্ষয়কুমারের কিন্তু ছিল। তাই তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাবলি কেবল অনুবাদে সীমাবদ্ধ ছিল না। বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও সংস্কৃতিকে জনজীবনে ও গণচেতনায় উন্মীলিত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। বিদ্যাসাগর কৌশলগত কারণে, উগ্র ধর্মান্ধতায় জারিত পণ্ডিত সমাজকে নিষ্ক্রিয় করার উদ্দেশ্যেবিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা প্রমাণে মনুসংহিতা ও অন্যান্য শাস্ত্র অনুসন্ধানের পথ বেছে নিয়েছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত কিন্তু বিধবাবিবাহকে আধুনিক বিজ্ঞান ও মানবতার দৃষ্টিতে সমর্থনযোগ্য করে তুলতে বহুমুখী চেষ্টা করেছেন। ১৮৫২ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'ধর্মনীতি' প্রবন্ধে তিনি বুঝিয়ে বলেন, স্ত্রী ও পুরুষকে একই নৈতিক ও সামাজিক মানদণ্ডে বিচার করতে হবে, লিঙ্গবৈষম্য দিয়ে নয়। কেননা সেই চেষ্টা অমানবিক ও অসামাজিক। তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, বিপত্নীক যদি বিয়ে করতে পারে, তাহলে বিধবার বিয়েতে আপত্তি কেন? ধর্মান্ধতার সঙ্গে তিনি কখনও আপস করেননি।

১৮৫৫ সালে অক্ষয়কুমার 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন অসুস্থতার জন্য (ভয়ানক শিরঃপীড়া)। তারপর বিদ্যাসাগরের অনুরোধে শিক্ষকশিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত নর্মেল স্কুলের উচ্চতর বিভাগে অধ্যক্ষ পদে যোগ দিয়েছিলেন। সেটাও ছাড়তে হল অসুস্থতার জন্য। অনুরাগীদের চিঠির উত্তর দিতে পারতেন না বলে ক্ষমাপ্রার্থনা করে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন সোমপ্রকাশ, সঞ্জীবনী এবং নিউজ অফ দ্য ডে পত্রিকায়। বালিতে একটা ছোট বাড়ি তৈরি করে বসবাস শুরু করেন। লাগোয়া জমিতে তৈরি করেন উদ্ভিদবিদ্যা চর্চার ক্ষেত্র 'শোভনোদ্যান'। সেই উদ্যানে ৩৮ রকমের বৃক্ষ, ১৫ রকমের ফুল ও সুদৃশ্য গাছ, ১৬ ধরনের মশলাজাতীয় গুল্মের তথ্য পাওয়া যায় নানাজনের বিবরণে। অক্ষয়কুমার রচিত 'চারুপাঠ' (তিন খণ্ড) ছাত্রমহলে ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল। তাই বিদ্যাসাগর এই উদ্যানের নাম দিয়েছিলেন চারুপাঠ, চতুর্থ খণ্ড। বাড়ির ভিতরে তৈরি করেছিলেন ভূতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা, যেখানে ছিল বিভিন্ন যুগের প্রস্তরখণ্ডের নমুনা, ফসিল ইত্যাদি। তাঁর পৌত্র বাংলা কবিতায় ছন্দের জাদুকর বলে খ্যাত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পিতামহকে 'হোমশিখা' কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করে লিখেছেন, 'বঙ্গীয় গদ্যের গৌরবস্থল, আমার পূজ্যপাদ পিতামহ'। বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তির মেলবন্ধন সম্পর্কেও অক্ষয়কুমারের স্বচ্ছ ধারণা ছিল।

ইংরেজ শাসনে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, মুদ্রণযন্ত্র প্রভৃতির প্রচলনে দেশের শিল্পবাণিজ্য বৃদ্ধির দরুন যেটুকু উন্নতি হয়েছে, তা বঙ্গভূমিকে 'কতিপয় বাহ্যশোভায় শোভিত' করলেও তিনি মানুষকে শোষণের জন্য ইংরেজ শাসকের ভূমিকার সমালোচনা করেছেন নির্মমভাবে। অক্ষয়কুমার লিখেছেন, 'বাণিজ্য বৃদ্ধির দ্বারা যেমন পূর্বাপেক্ষা এক্ষণে এদেশে দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে, সেরূপ বেতনভুক পরিশ্রমী লোকের শ্রমের মূল্যবৃদ্ধি হয় নাই।' সেই সময় এই দৃষ্টিভঙ্গিকে অভূতপূর্ব বলতেই হবে। তাই বলে প্রযুক্তিকে বর্জন করার কথা কিন্তু তিনি বলেননি। বাষ্পীয় রথারোহীদের প্রতি উপদেশ (১৮৫৫) গ্রন্থটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি চিনি, ময়দা, সুতার কল, কাগজের কল, টাকশালে যেতেনযন্ত্রবিজ্ঞানকে অধ্যয়ন করবেন বলে। সমুদ্রে গিয়ে দূরবিন চোখে পৃথিবী সত্যিই গোলাকৃতি কিনা, তা পরীক্ষা করতেন। জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলোচনা করতেন সমুদ্রবিজ্ঞান নিয়ে। ইচ্ছে করে বারবেলা, কালবেলা, কালরাত্রি, অশ্লেষা, মঘা, ত্র্যহস্পর্শ প্রভৃতি 'অশুভ' দিনক্ষণ দেখে ঠিক সেইসময় ও লগ্নেই ভ্রমণে বের হতেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে পল্লির প্রজাদের দুরবস্থার শরিক হতেন। বাংলা ও ইংরেজি ছাড়া জানতেন সংস্কৃত, গ্রিক, ল্যাটিন ও হিব্রু এবং ফরাসি ভাষা।

গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা, নৃবিজ্ঞান, বিবর্তন তত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। ২০২০-র ১৫ জুলাই তাঁর দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী পূর্ণ হয়েছে। বাঙালি তাঁকে খুব একটা মনে রেখেছে কিন্তু বলা যাবে না। যদিও ঘটা করে তাঁর ছবিতে ফুলচন্দন দিলে বা পঞ্চধাতুর মূর্তি স্থাপন করলেওকিছু এসে যেত না। বেঁচে থাকতেই ভাববাদের বিপরীত পথের অভিযাত্রী এই একলা পথিক লিখে গিয়েছেন, 'যদিবা আমার কীর্তি স্থায়ী হয়, কিন্তু আমি তো চিরস্থায়ী নই। মৃত্যুর পরে আমি সেই কীর্তি ঘোষণা শুনিতে আসিব না।' অক্ষয়কুমারের মতো মনীষীর কোনও মূর্তি কোথাও স্থাপিত হয়েছে কিনা, আমার জানা নেই। ঋণ স্বীকারে আমরা সকলেই উন্মুখ, ঋণশোধ করার ব্যাপারে কিন্তু প্রবল অনীহা। এই মন্তব্যটিকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই, তাহলে নিজেদের মুখ আয়নায় দেখতে লজ্জা করবে।

(লেখক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার)

> বাঙালি তাঁকে খুব একটা মনে রেখেছে কিন্তু বলা যাবে না। যদিও ঘটা করে তাঁর ছবিতে ফুলচন্দন দিলে বা পঞ্চধাতুর মূর্তি স্থাপন করলেও কিছু এসে যেত না। বেঁচে থাকতেই ভাববাদের বিপরীত পথের অভিযাত্রী একলা পথিক অক্ষয়কুমার লিখেছিলেন, 'যদিবা আমার কীর্তি স্থায়ী হয়, কিন্তু আমি তো চিরস্থায়ী নই। মৃত্যুর পরে আমি সেই কীর্তি ঘোষণা শুনিতে আসিব না।'